বাইশ বছর

(গল্পগ্রন্থ – যাত্রাবদল)

খবরের কাগজের অফিসে সন্ধ্যার পর আড্ডা চলছিল। 'তরুণ' শব্দটার ওপর ভয়ানক জোর দিয়ে কথা বলা তখন দিনকতক খুব চলছিল—সেই সময়কার ব্যাপার। তরুণসাহিত্যের ভবিষ্যৎ, তারুণ্য, তরুণ দৃষ্টিভঙ্গি, তরুণ সমিতি, তরুণের অভিযান, তরুণের জয়যাত্রা—মাসিক পত্রিকা ওকথাসাহিত্য তখন তরুণ-বায়ুগ্রস্ত ! ওদিকে পরশুরাম তখন 'কচি সংসদ্' গল্প লিখ্‌লেন, তা নিয়ে দুটো দলের সৃষ্টি হল, একজন বল্‌লে—আঃ, কি ঠোকাই ঠুকেচে ! আর একজনবল্‌লে—যাদের নিজেদের জীবনের পুঁজি বহুকাল ফুরিয়েচে, যাদের প্রাণের তারে মর্‌চে ধরেচে, তারা তরুণের মনকে বুঝবে কেমন করে ! সমস্ত মহী গ্রাস করতে ছুটেছে তরুণেরজয়রথ-চক্র, তার উদ্দাম, অশান্ত বেগের সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা ধরে, তাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবারস্পর্ধা রাখে কোন্ ওল্ড ফসিল্ ?...ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটের ওপর শেষের দলটাই বেশি পুষ্ট—তরুণের বিরুদ্ধে যারাকথা বলছিল চেয়ে দেখলুম তারা সকলেই মধ্যবয়সী, অপরপক্ষে তরুণ ও প্রৌঢ় দুই-ই আছে—এবং স্বয়ংসম্পাদক যিনি, ষাট্ বৎসরের বৃদ্ধ হলেও তিনি ছিলেনতরুণের সপক্ষে।

কাগজের অফিস থেকে বার হয়ে এসে একটা পার্কের বেঞ্চিতে বসলুম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সত্যিই তরুণেরাই জয়ী—কিন্তু সে বয়সটাকে বহুকাল হারিয়েচি। মাথার চুল ছ-আনা আন্দাজ পাকা, পরিচিত ছোকরার দল সামনে বিড়ি সিগারেট খায় না, হঠাৎ সামনাসামনি হয়ে গেলে বিড়ি মুখে থাকলে তাড়াতাড়ি ফেলে দেয়। সমীহ করে কথা বলে—আর বয়োবৃদ্ধ লোকের পরিচয় দিতে গেলেই বলে,—"আজ্ঞে তাঁর বয়েস হয়েচে, এই প্রায় আপনার বয়েসি হবেন।" তা সে কি জানে চল্লিশ—কি জানে পঞ্চাশ—আমার বয়েসি, 'তাও প্রায়'—অর্থাৎ আমিই বড়। কারণ কুড়ি, বাইশ, পঁচিশ বয়সের ছাক্‌রারা চল্লিশে আর পঞ্চাশে বিশেষ কোনো তফাত দেখে না। এদিকে বাড়িতেও বড় সংসার, সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে 'বাবা''বাবা' অনবরত শুন্‌তে শুন্‌তে মনটাও অনেকটা গম্ভীর প্রবীণত্বের দিকে ঝুঁকে চলেচে বৈকি। ছোট মেয়েটা কাছে এলেই বলে—বাবা, তোমার পাকা চুল তুলে দেব ?

নাঃ, মনটা খারাপ হবারই কথা বটে। রাত ক্রমে বেশিহল, পার্কের মধ্যে কুলপিবরফওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে, মোড়েরমাথায় বেলফুলের মালা বিক্রি হচ্ছে, রাস্তার লোক চলাচল ক্রমে কমে আস্‌চে। জ্যোৎস্নারাত, চাঁদ ভাঙ্গা মেঘের মধ্যেলুকোচুরি খেল্‌চে।

কত বছর বয়সের মানুষকে ঠিক তরুণ বলা চলে ?উনিশথেকে বত্রিশ, না আঠারো থেকে আটাশ, না কুড়ি থেকে পঁচিশ ?এ-বয়েস একদিন আমারও ছিল—ওর চেয়েও কম ছিল। কিন্তু তখন কেউ বলে দেয়নি যে আমি তরুণ বা তার জন্যে একটা কিছু হয়েচে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তার উল্টোটাই শুনে এসেচি চিরকাল। কখনো বুঝতে পারিনি যে আমারবয়স অল্প।

সেই কথাটাই আজ রাত্রে আমার বেশি করে মনে এল।

ছেলেবেলায় আমি ছিলাম খুব রোগা শীর্ণ—অসুখেভুগতাম বছরে ন'মাস। হাতে তাবিজ-কবজ, গলায়আমড়ার আঁটি, কোমরের ঘুন্‌সিতে বাদুড় নখ—সমস্ত দেহে নানা ধরনের বাধা ও গণ্ডি—মৃত্যু যাতে হঠাৎ ডিঙিয়ে এসেআমাকে নিয়ে না পালায়।

এই কারণে ইস্কুলে ভর্তি হতে হয়ে গেল দেরি। যেক্লাসে গিয়ে ভর্তি হলুম, সে ক্লাসের মধ্যে আমিই বড়। সকলে আমাকে ডাকতে লাগল—"কানু-দা' বলে। কিন্তু প্রথমে ততটা বুঝতে পারিনি যে আমার বয়েসটা এমন বেখাপ্পা গোছের বেশি। একদিন হল কি, তখন মাস দুই ভর্তি হয়েচি, মামার বাড়ি যাওয়াতে দিন তিনেক ইস্কুলকামাই হল—তারপর যেদিন ইস্কুলে গেলাম, ফণিমাস্টারেরক্লাসের পড়া হল না। ফণিমাস্টার আমার চুল ধরে টেনেবল্লে—বুড়োধাড়ি কোথাকার, শিং ভেঙে বাছুরের দলেমিশেচে—আবার ইস্কুল কামাই করে। ছেলেরা অনেকেখিল্-খিল্ করে হেসে উঠল আমার দুর্দশায় খুশি হয়ে।বাবার আপিসের পেন্সিলের ও 'পেন্সিল-ঘষা' রবারেরপ্রত্যাশা রাখত যে সব ছেলে, তারাই চুপ করে রইল। এইআমি প্রথম জানলুম যে আমার বয়স বেশি। এর আগে কেউআমাকে এ-কথা বলেনি। বাড়িতে দিদি ছিলেন আমার চেয়েবড়। মা বাবা এদের মুখে কখনো

আমার বয়েস সম্বন্ধেশ্লেষ-সূচক কোনো কথা শুনিনি। কিন্তু আজ থেকে আমার ধারণা বদলে গেল—তখন বুঝলাম কেন ক্লাসের ছেলেরাআমায় ‘কানুদা’ বলে ডাকে। এবং এই দিনটি থেকে ক্লাসেরপড়া না বলতে পারার অক্ষমতার চেয়েও আমার বয়সেরলজ্জায় সব সময় সঙ্কুচিত হয়ে থাকতুম। ফণিমাস্টারও কি প্রতিবারই প্রতি পদে পদেই আমার সে গোপন লজ্জা, যাআমি লোকচক্ষু থেকে লুকিয়ে রাখতে প্রাণপণ করি, তা-ই ঢাক পিটিয়ে সকলের সামনে প্রচার করবে আরআমার সে অত্যন্ত নিভৃত গোপন ব্যথার স্থানে কারণে অকারণে আঘাত করবে নির্মমভাবে ?এদিকে বয়সেরতুলনায় আমি একটু লম্বা ছিলাম। একদিন গ্রামারের কি ভুলবার হতেই ফণিমাস্টার বল্লে—নাঃ, এ ধাড়ি ছোঁড়াটাকেনিয়ে আর পারা গেল না দেখ্‌চি। বলি গোঁফ-দাড়ি যে লতিয়ে চললো, এখনো নাউনের পার্সিং শিখলে না ?আমার চোখে লজ্জায়, অপমানে জল এল। আমার মনে হলবাস্তবিকই আমার বয়েস বেশি, তাতে নীচের ক্লাসের ছোটছোট ছেলেদের সঙ্গে পড়া আমার পক্ষে লজ্জার কথা—প্রতিদিন ওদের চোখের সামনে আমি এরকমভাবেবকুনি খেতে আর পারি নে, বিশেষ করে ওই ছোট ছোটছেলেরা—যারা আমায় দাদা বলে ডাকে, তাদের সামনেইআমার এ অপমানের লজ্জা অসহ্য।

বাড়ি গিয়ে মাকে লাজুক মুখে বললুম,—আমি আরস্কুলে পড়ব না মা ! আমার ক্লাসের ছেলেরা ছোট ছোট, আমার লজ্জা করে ওদের সঙ্গে পড়তে।

মা অবাক হয়ে বললেন—কেন রে, তোর বয়স কতহয়েচে ?

—তুমিই বলো না কত হয়েচে ?

—এই তেরোয় পড়বি আষাঢ় মাসে—বারো বছর ন’ মাস চল্‌চে—

—ও বয়সে কেউ বুঝি সিক্‌সথ্ ক্লাসে পড়ে ?

—না, তুমি একেবারে বুড়ো হয়ে গিয়েচো—তোমার দাঁত পড়ে গিয়েচে, চুল পেকে গিয়েচে—তুমি কি আরসিক্‌সথ্ ক্লাসে পড়তে পারো ?পাগ্‌লা একটা কোথাকার—

মায়ের কথায় আমার মনের সন্দেহ দূর হল না। নিজেরছেলেকে কেউ বড় দেখে না—ওঁরাই আমায় ছোট বলেন, কই আর তো কেউ বলে না ?হায় আমার সে তেরো বছরবয়সের শৈশব ! এখন সেই কথা ভাবি।

বয়েস আর কম্‌লো না—বেড়েই উঠতে লাগল। বাকিক’বছরের মধ্যে আমার চেয়ে বড় কোনো ছেলে এসে ভর্তিহল না আমার ক্লাসে, আমিই সকলের ‘দাদা’ রয়ে গেলুম।এর পরে ক্লাসে আমি পড়াশুনোতে খুব ভালো হয়ে ফার্স্ট, সেকেন্ড হয়ে উঠতাম—কিন্তু তাতে আমার গৌরব বাড়লোনা। আমি সকলের চেয়ে বয়েসে বড়, আমি পড়াশুনোতেভালো করব, এতে বাহাদুরিটা কি ?

এই সময় আবার আমার গোঁপ বেরুল একটু একটু—সেই ‘ড্রেডেড্’ গোঁপ, যার কথায় চিরকাল খোঁচা খেয়েআসচি—যখন সত্য সত্যই সেটা বেরুলো—তখন মরিয়া হয়ে সহ্য করলুম। প্রথম প্রথম বড় লজ্জা হত—শেষে সয়েগেল।

একবার আমাদের ওখানে রামেন্দুবাবু উকিলের বাড়িতেতাঁর ভাগ্নে এল—তার নাম প্রসাদ, কলকাতায় কলেজে বি.এ. পড়ে। খুব ভাব হয়ে গেল তার সঙ্গে—হঠাৎ কথায়কথায় একদিন সে তার বয়েস বল্লে উনিশ বছর, আমি মনেহিসেব করে দেখলুম আমারও ওই বয়েস—অথচ আমিএবার ম্যাট্রিক দেবো—আর ও পড়ে বি.এ. থার্ড ইয়ারক্লাসে। ক্লাসের সবাই ঠিক বলে, আমার বয়েস বেশি, আমি যে পড়াশুনোতে ভালো করব এ আর বিচিত্র কি ?

ম্যাট্রিক দেবার সময়ে হেডমাস্টারের কাছে ফর্ম লিখবার সময় অন্য সব ছেলে লিখলে ষোল, সতেরো। ধীরেন বলেএকটা ছেলে ষোলর চেয়েও কম বলে তাকে হেড্‌মাস্টারপরীক্ষা দিতেই দিলেন না—আর আমি লজ্জায় মুখ নীচুকরে, কানলাল করে বয়সের জায়গায় লিখলুম—উনিশ বছরক’মাস। এমন বিড়ম্বনাতেও মানুষ পড়ে ?

এই সময় আমি আর এক দুর্ভাবনায় পড়ে গেলুম। অনেকদিন আগে আমার আট-ন' বছর বয়েসে আমার মামা এসেছিলেনআমাদের বাড়িতে। তাঁর গোঁপ বেরিয়েছিল, খুবলম্বা-চওড়া—তাঁকে আমার খুব বড় বলেই মনে হত—আমিতাঁর বুকে হেলান দিয়ে বসতাম সে সময়—আমাকে কাঁধেপিঠে করে নিয়েও কত খেলা করেচেন। তখন শুনেছিলামমা'র মুখে যে মামার বয়েস বাইশ বছর ! উঃ, সে কতবয়েস ?তাঁর দিকে চেয়ে তখন ভাবতেই পারতুম না, আমারশৈশবমনের জগতের অনন্ত কালসমুদ্রে 'বাইশ বছর' বলেএকটা পরিচিত, একটা সুদূর দ্বীপ—আমার বয়োবৃদ্ধ মামাছিলেন সেই দ্বীপের অধিবাসী—তার ওদিকে কি আছে আমি জানতাম না, ভাবতেও চেষ্টা করিনি তখন; সেই থেকেবাইশ বছরের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা ছিল যে—যারবয়েস বাইশ বছর, তার জীবন ফুরিয়ে এল।

এই ম্যাট্রিক দেবার বছরে আমার হঠাৎ মনে হল, আমার বয়েস কুড়িতে পড়বার আর দেরি নেই—এবং সেই ভীষণ বাইশ বছরে আসবার দেরি মাত্র দুটি বছর। আরো মুশকিলবাধল এই যে—এতদিন ছিল গোঁপ, এইবার আমার এমনঅবস্থাতে এসে পৌঁছুতে হল যে দাড়ি না কামালে আর চলেনা।গোঁপ ও দাড়ি দুই-ই হল। গোঁপ-দাড়ি এবং কুড়ি বছরেপা দেবার দেরি মাস কতক মোটে—তার পরে বছর দুই পরেই বাইশ বছর।

কিন্তু তখনকার দু'বছর অনেক সময়—আজকালকার মতো নয়। মন ছিল চিন্তাশূন্য, স্ফূর্তিবাজ, কৌতুকপ্রিয়, দু'বছর আস্‌তে দেরি হয়ে গেল। এল বাইশ বছর, চলেওগেল !

তখন যদি কেউ বলতোও যে আমার বয়েস কম, বাইশ বছর আর এমন কি বয়েস—তাহলেও হয়তো তার কথাআমার বিশ্বাস হত না, যেমন বারো বছর বয়সে বিশ্বাসকরিনি মায়ের কথা যে আমি ছোট—কিন্তু আসলে সে-কথাআমাকে কেউ বলেওনি।

বরং আরো একটা ঘটনায় তার উল্টো কথাটাই একবার শুনলাম। তেইশ বছর বয়েসে আমার বিবাহের জন্য কোথা থেকে একটা সম্বন্ধ এল—আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ছি। ঘটক আমাকে দেখে বল্লে—ছেলের বয়স একটু বেশি না ?

বাবা সামনে বসে। বল্লেন, কোথায়, এই তো মোটেতেইশ—

আমি ভাবলাম, বেশ তো ?বাবা ওরকম কথা কেনবল্লেন ?ছিঃ, ওরা কি মনে ভাবলে ?মোটে তেইশ মানে কি ?সেই থেকে আমার বিশ্বাস হল যে বিবাহ করবারওআমার বয়স আর নেই। ঘটক নিশ্চয় আমার লম্বা-চওড়ামূর্তি দেখে আমার বয়স বেশি আন্দাজ করেছিল—তেইশ বছরের অনুপাতে আমার চেহারা বড় ছিল। কিন্তু আমারসেই থেকে বিশ্বাস দাঁড়ালো অন্যরকম।

চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ..

ত্রিশ বৎসর বয়সে যেদিন পড়লাম, সেদিন থেকে মনেহল এখন থেকে গম্ভীরভাবে চলাফেরা করতে হবে, সাদারং ছাড়া অন্য রঙের জামা পরা তো অনেকদিনইছেড়েছিলুম, এখন থেকে ছোট বড় চুল ছাঁটা পর্যন্ত ছেড়ে দিলুম। তখন থাকতুম পাড়াগাঁয়ে, সেখানে কেউ কোনো দিনএকথা বলেনি যে আমার বয়েস খুব বেশি এমন কিছু নয়।পাড়াগাঁয়ে কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, ত্রিশের পরেই বৃদ্ধত্বে পৌঁছোয়, মনে তো বটেই, চেহারাতেও খানিকটা বটে।

কারণ আমাদের মুখশ্রীকে আমরা অহরহ গড়চি, আমাদের ভাব ও চিন্তার দ্বারা, যেমন ভাস্কর বাটালি দিয়ে মূর্তির মুখ গড়ে। এদের প্রভাব আমাদের মুখশ্রীর ওপরে অনেক বেশি, অন্তরের তারুণ্য মুখশ্রীতে তো বটেই, সারাদেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এমন কি দৈহিক স্বাস্থ্যের ওপরও। বাল্যের কত সুন্দর-মুখ ছেলেকে যৌবনে হতশ্রী, হীনশ্রী হতে দেখেছি, শিক্ষার ও কালচারের অভাব। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কত লোকেরও দেখেছি, বিধাতা যেন তাদের দেহ ও মুখশ্রীকে কি চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত ভেঙে গড়েচেন।

এ সব অবান্তর কথা যাক্‌।

তারপর আজ এতকাল পরে যখন পঞ্চাশের কোঠায়বয়েস চল্‌চে,—কাগজপত্রে লোকের মুখে শুনি কুড়ি বছরবয়েস থেকে তরুণ বয়েসের নাকি শুরু—মোটের ওপরবাইশ বছরটা যে নিতান্ত তরুণ বয়েস, এতকাল পরে তা বুঝছি খুব ভালো করেই। কারণ আমার বড় ছেলেরই প্রায়হতে চলেচে ওই।

কিন্তু শুনলাম কখন, যখন বয়োবৃদ্ধ ভীষ্ম পিতামহমর্ত্যধামে ফিরে এলেও আর আমাদের তরুণ বলতে সাহসকরবেন না, স্নেহপরবশ হয়েও নয়। লোকলজ্জার ভয় একটাআছে তো ?

হায় রে আমার বাইশ বৎসরের প্রথম যৌবন, তুমি যখনএসেছিলে, তখন তোমায় চিনিনি, তারপর পৃথিবী নিজেরকক্ষপথে বহুদূরে চলে গিয়েচে সে দিনটির পরে, আজ আরতোমার জন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লাভ কি ?কিন্তু মুশকিলএই যে তখন একথা বল্লেও বিশ্বাস করতুম না। একটা কথা মনে এল। চব্বিশ বছর বয়সে একবার টুর্গেনেভের কোনোএকখানা বইয়ে পড়ি যে ভালোবাসা, প্রেম, রোমান্স সব তরুণদের জন্যে। যৌবন ফুরিয়ে গেলে ওসবের দিন শেষহল। কথাটা পড়ে মনে বড় কষ্ট হয়েছিল,—এই জন্যে যে আমার আর সেদিন নেই—বাইশ বছরের গণ্ডি অনেক দিনছাড়িয়েচি, যৌবন কতকাল শেষ হয়ে গিয়েচে।

তাই বলচি—যদি কেউ একথা বলত তখন যে আমারবাইশ বৎসরে তরুণ বয়সের অবসান নয়, সবে শুরু—একথা আমি বিশ্বাস করতুম না নিশ্চয়।

মা তো বারো বছর বয়সে বলেছিলেন আমিছেলেমানুষ, সে তো নিতান্ত বাল্যকাল, মায়ের কথা কিবিশ্বাস করেছিলাম ?